BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03060011

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 06| June 2025| e-ISSN: 2584-1890

বাংলার যাত্রাপালায় যাত্রাগানের বিবর্তন

Minati Sau Bhaumik

SACT-II, Vivekananda Mission Mahavidyalaya, saubhaumikminati@gmail.com

Abstract:

যাত্রাগান সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বাংলার যাত্রাপালায় যাত্রার প্রাণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন রায়, রসিকলাল চক্রবর্তী, মুকুন্দদাস, গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা কবিগানের প্রভাবে অশ্লীলতার অভিযোগে বিপন্ন যাত্রাকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলার কাজে সাফল্য পেয়েছিলেন। শ্রোতাদের চাহিদা পূরণের জন্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'খেমটা' নাচের সঙ্গে চটুল ও হালকা সুরের গান ব্যবহৃত হয়েছে। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, ব্রজমোহন রায়, মুকুন্দ দাস, উৎপল দত্ত, শৈলেশ গুহনিয়োগী প্রমুখ যাত্রাশিল্পীর হাত ধরে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে পুরো বিশ শতক জুড়ে বাংলা যাত্রার গানে বহু ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে, গান রচনায় কাব্যগুণের কত বিচিত্র সমাহার ঘটেছে। বর্তমান শতাব্দীতে প্রায় সূচনা কাল থেকেই হিন্দি-বাংলা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন গানের ব্যবহার এতটা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে যে, মৌলিক যাত্রাগানের চর্চা বিলুপ্তির পথে হারিয়ে যেতে বসেছে।

Keywords: *যাত্রা, যাত্রাপালা, যাত্রাগান, যাত্রা সঙ্গীত।*

Introduction:

এখনো পর্যন্ত কোনো পুরোনো দিনের প্রসঙ্গ উঠলেই, বাংলা যাত্রার সঙ্গীতগুণের কথা অবধারিতভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। নানা ধরনের পরিবর্তন সত্ত্বেও, সঙ্গীতই যাত্রার প্রাণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চলের প্রধান শ্রোতা-দর্শকরা যাত্রাকে 'গান' বলতেই অভ্যস্ত। যেজন্য তাঁরা বলেন যাত্রা 'শুনতে' যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে সঙ্গীতের ব্যবহার কমিয়ে, সংলাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, নানা রকম দৈহিক কায়দাকসরত প্রদর্শনের চমক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায়, 'শোনা'র বদলে 'দেখা'র বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এখন আর যাত্রা শুনতে যায় না, শ্রোতারা বরং দর্শকরা বলেন যাত্রা দেখতে যাচ্ছি। পুরোনো দিনের যাত্রাপ্রেমীরা, অভিনীত পালায় সঙ্গীতের কোনোরকম ঘাটতি দেখলে তীক্ষ্ণ ভাষায় কটাক্ষ করতেন। যাত্রার প্রতি অনুরক্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রভাবে সঙ্গীতের যথেচ্ছাচার ও অবনমনকে আক্রমণ করে তাঁর সমকালের যাত্রার সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—

“যাত্রার সমস্ত রাত্রি গাহিতে হইবে, অতএব অনেক গীত আবশ্যক। সঙ্গত হউক, আর অসঙ্গত হউক, ভাবপূর্ণ হউক আর না হউক, গীত গাঁথিতে হইবে গাহিতেও হইবে। ...আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়া লোকের পরিতৃপ্তি সাধন করা। যে সকল কবি এক্ষণে গীত বাঁধিতেছেন তাঁহারা ক্রমে সেই সকল চিত্তবৃত্তিকে ঘৃণিত ও অপবিত্র করিয়াছেন।”[১]

Discussion:

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘খেমটা’ নাচের সঙ্গে চটুল ও হালকা সুরের গান ব্যবহৃত হয়েছে, শ্রোতাদের চাহিদা পূরণের জন্য। নাচ-গানের সেই প্রাদুর্ভাবের কালে যাত্রা সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। হুগলি কলেজে অথবা কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত থাকার জন্যে, সেই জনশ্রুতি অনুসারে তিনি মদনমাস্টার নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। আবার কেউ কেউ অনুমান করেছেন, যাত্রাদলের অধিকারী অথবা সুর রচয়িতাদের সম্বোধনের রীতি অনুসরণ করেই তাঁর নামের সঙ্গে ‘মাস্টার’ অভিধাটি যুক্ত হয়েছিল। তিনি লোকনিন্দার হাত থেকে উদ্ধার করে যাত্রার সাংগীতিক গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রাগরাগিণী ও ভাবের অনুসরণে গান বাঁধার রীতি প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। চুকি ঢঙের চাহিদাকে চাপা দেওয়ার জন্য এবং সুরের একঘেয়েমি কাটিয়ে নতুনত্ব আনতে মদনমোহন ‘জুড়ি’র প্রবর্তন করেন। মেথর-মেথরানি, ভিস্তিওয়ালা প্রভৃতি সং দিয়ে যাত্রাপালা আরম্ভ করবার পূর্বরীতি পরিহার করে তিনি হাস্যরস পরিবেশনের জন্য পালার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলিকে ব্যবহার করতেন। মূল রাগ-রাগিণী গাওয়ানোর জন্যই তিনি কয়েকজন সুগায়ক গ্রহণ করে ‘জুড়ি’র দলের সৃষ্টি করেছিলেন। পুরুষের গান বয়ঃবৃদ্ধ জুড়ির এবং স্ত্রীচরিত্রের গান বালকদের কণ্ঠে গাওয়াতেন।

মদনমোহন প্রথমে একটি শখের যাত্রাদল গঠন করলেও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেটিকে তিনি পেশাদার দলে পরিণত করেন। দলের জন্য, ‘তিনি নিজেই পালা লিখতেন। তাঁর রচিত প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, রাম বনবাস ও হরিশ্চন্দ্র পালা তাঁর দলে অভিনীত হয়েছিল।’[২] মদনমোহন-রচিত পালাগুলি উদ্ধার করা সম্ভব না হলেও, তাঁর লেখা সমসাময়িককালে কী ধরনের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা বোঝা যায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ‘বাঙ্গালীর গান’-এ (১৯০৫) তাঁর আটটি গানের অন্তর্ভুক্তি দেখলে। এছাড়াও তাঁর তিনটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় অধরচন্দ্র চক্রবর্তী সংগৃহীত ‘রেকর্ড-কাকলী’ সংকলনে।[৩] যাত্রাগানের জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন রায়, রসিকলাল চক্রবর্তী, মুকুন্দদাস প্রমুখ পালা রচয়িতাদের গান ‘বাঙ্গালীর গান’ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এই সংকলনে কৃষ্ণযাত্রার সুখ্যাত বেশ কয়েকজনের গানও গৃহীত হয়েছে। তাই অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যাত্রার গান কীভাবে জনসমাদর লাভ করেছিল। তাঁদের লেখা পালায় কীর্তনও একটা মুখ্য বাহন হয়ে উঠেছিল। কবিগানের প্রভাবে অশ্লীলতার অভিযোগে বিপন্ন যাত্রাকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলার কাজে সাফল্য পেয়েছিলেন শিশুরাম, পরমানন্দ, শ্রীদাম-সুবল দুই যমজ ভ্রাতা, প্রেমচাঁদ, বদন -এঁদের প্রত্যেকেরই নামের সঙ্গে পদবি-পরিচিতি অধিকারী হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রার প্রচার ও প্রসারে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভক্তদর্শকমণ্ডলীতে কণ্ঠ বা কণ্ঠমহাশয় নামে সমাদৃত হয়েছিলেন। বৃন্দা চরিত্রের রূপায়ণে নীলকণ্ঠের খ্যাতি সমকালে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

কৃষ্ণযাত্রা পরম্পরায় ‘তুক্কো’ প্রথার প্রবর্তন বহুকাল ধরে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে সমাদৃত ছিল। পদাবলী কীর্তনে ‘তুক’-কেই তুক্কগান বলা হয়। অনুপ্রাসবহুল কীর্তনের ‘ছন্দোময়’ মিলনান্তক’ কলি একসময় বিশেষভাবে চর্চিত হয়েছিল বাংলা গানের ধারায়। পরমানন্দ এই প্রথার জনপ্রিয়তা এনে কীভাবে উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

“গীতের ভাগ পরমার যাত্রায় নিতান্ত অধিক ছিল না, কাব্যরস ঘটাইবার নিমিত্ত পরমা কথা বার্তাই অধিক কহিত। সেই কথার যে যে অংশে গীত ছিল, তাহা প্রায়ই পয়ারের ছন্দে রচিত এবং তাহা প্রায়ই পয়ারের সুরেই গাওয়া হইত; কিন্তু তাহার শেষ ছত্রটীতে একটু করিয়া অমৃত থাকিত, শ্রোতার কর্ণে সেইটুকু ঢালিয়া দিবার নিমিত্ত কীর্তনের সুরে সেই ছত্রটি গাওয়া হইত। লোকে একেবার যেন আর্দ্র হইয়া যাইত। এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলিত। অনেকে তর্ক করেন, পরমার তুক্কোর ন্যায় সুশ্রাব্য আর কিছুই বাঙ্গালায় হয় নাই।”[৪]

পরমানন্দের তুক্কো-প্রয়োগের মাধুর্য তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ধরন হারিয়েছিল- বিশেষ করে কীর্তনের সুরে তিনি যেভাবে তুক্কো পরিবেশন করতেন। তবে পরমানন্দের উত্তরাধিকারী হিসেবে যাঁরা পরবর্তীকালে নিজেদের পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছিলেন, তাঁরা তুক্কো প্রয়োগে পরিবর্তনসাধন করে লোকরঞ্জনের চাহিদা পূরণ করেছিলেন। বদন অধিকারী ও গোবিন্দ অধিকারীর পালায় তুক্কো নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সম্ভবত গানের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একটানা সুর করে কবিতা পরিবেশন করা, এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মদনমোহন প্রবর্তিত জুড়িগান অব্যবহিত পরবর্তীকালে মতিলাল রায়-এর পালায় আরো চমকপ্রদভাবে ব্যবহৃত হত। মতিলাল, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায় জুড়ি গানকে যেমন জনপ্রিয় করেছিলেন, তেমন বালকগণের গান সংযোগ করে যাত্রাগানে বৈচিত্র্য এনেছিলেন। এছাড়াও একক গায়কের গান ও সখীদলের নৃত্যগীত তাঁর প্রযোজনায় বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। মতিলালের আড়ম্বরপূর্ণ উপস্থাপনার বিবরণ দিয়ে ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

“একশত পঁচিশ থেকে দেড়শ’ জনের মত লোক ছিল তাঁর যাত্রাদলে। জুড়ি থাকতো সাধারণতঃ আট দশ জন-’ছেলে’ বা ‘বালক’ ছিল পঁচিশ ত্রিশ জন। উৎকৃষ্ট বেহালা-বাদক ছিল চার পাঁচ জন। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য যন্ত্র-বাদকও ছিল। ...জুড়িদের পরণে থাকতো সাদা পায়জামা এবং উত্তমাঙ্গে থাকতো মূল্যবান মখমল জাতীয় কাপড়ের আলখেল্লা। এই জামার সর্বাঙ্গে থাকতো জরির কাজ, আর থাকতো অনেকগুলি বড় বড় বোতাম। ‘ছেলে’দের গায়ে থাকতো জরির কাজ-করা দামী ভেলভেটের কোট আর পরণে পায়জামা। ছেলেদের মাথায় থাকতো দামী টুপী,-তাতে বড় বড় হরফে লেখা থাকতো ‘মতিলাল রায়’।”[৫]

ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য জুড়ির গানের সঙ্গে বালকগণের গানের পার্থক্য সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

“জুড়ির গান ছিল সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গের, রাগ-রাগিণীর কৌশল প্রদর্শন ছিল জুড়ির গানে বেশী। বালকেরা প্রেম ও ভক্তিমূলক গান করতো। এদের গানে রাগরাগিণীর প্রাধান্য ছিল না। কখনও বা ছেলেরা কোন গান অসমাপ্ত অবস্থায় ‘তারায় ছেড়ে দিত, জুড়ি যেন ঐ গানটি ‘মুদারা’য় ধরে ‘উদারা’য় তুলতেন। বালকেরাও আসরের চারিদিকে সারি দিয়ে দাঁড়াত, শ্রোতার দিকে মুখ ফিরে। জুড়িদের মত তারাও মাঝে মাঝে দিক পরিবর্তন করতো। কখনও কোন ‘একানে’ গায়ক উঠে দাঁড়িয়ে বেহালার সঙ্গে গান করতেন; কখনও একক গায়ক নেপথ্যে গান গেয়ে করুণ রস সৃষ্টি করতেন। সাধারণত পট পরিবর্তনের সময়েই সখীদের নাচ-গান হোত।”[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রভাবে যাত্রাগানের বহিরঙ্গে নানা চমকপ্রদ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। মতিলাল রায় তাঁর নিজস্ব দলের নামকরণ করেন ‘নবদ্বীপবঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়’, যা তদানীন্তনকালে যাত্রাগানের মাধ্যমে জন-মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাদর লাভ করে। পেশাদার মঞ্চের প্রভাব যাত্রাপালাকে গীতাভিনয়ে রূপান্তর করে এক ধরনের অভিনবত্বের সূচনাকে ক্রমশ বিস্তার দিয়েছিল। নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সংলাপ ও ভাবাবেগের উপর জোর দেওয়া হত -এই পরিবর্তনের সূত্র ধরে প্রথানুসারী জুড়ির গান বর্জনের ঝোঁক দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর একটি নিবন্ধে কৌতুকপূর্ণ একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—

“আগে একটি পালায় ৪০/৪৫ খানা গান থাকত। আর সংলাপের মাঝে মাঝে বাঁশি উঠে তাদের কসরৎ দেখাত। এই ভয়াবহ কসরতের সময় আসরের অভিনেতাদের ব্যবস্থা কল্পনা করুন। এক আসরে ‘সাবিত্রী সত্যবান’ নাটক অভিনীত হচ্ছিল। সত্যবানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে সাবিত্রী যখন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, এবং যম বারবার অনুনয় করতে লাগল মৃতদেহ ত্যাগ করতে, এমনি সময় উঠল জুড়িওয়ালারা। আধঘণ্টা গান গেয়ে তারা সাবিত্রীর অনুভব, উপলব্ধি সব মাটি করে দিল। সাবিত্রী যমরাজকে বললেন, ‘হে ধর্মরাজ, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আপনি এই জুড়িওয়ালাদের বেঁধে নিয়ে যান।”[৭]

প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী আসর থেকে জুড়ি-বিদায়ের বিষয়ে তাঁর অল্প বয়সের কৌতুকপূর্ণ একটি অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছেন—

“একটা মজা তখন দেখেছি, পেশাদারী দলে জুড়ি যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু লোকে তা চাইত না। ১৯১০-১১ সালে মথুর সা-র জুড়ি তৈরি করেয়েছিল ছেলেদের দিয়ে, কিন্তু তাতে ঠিক জমাট জিনিসটি পাওয়া যেতো না। শখের দলের ‘জুড়ি’রা বেশ তারিফ পাচ্ছে, পেশাদারী দলের ‘জুড়ি’ বাহবা পায় না কেন? এ নিয়ে নানা গল্প তখন প্রচলিত ছিল। পেশাদারীর জুড়িতে দোয়াররা ছিল অধিকাংশই বুড়োর দল, দিনের পর দিন গাওনা ত, বেচারীরা অত্যধিক শ্রমে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ত। কারুর কারুর আবার ‘অহিফেন’ সেবনের অভ্যাস ছিল। জুড়ি গাইছে- পার্বতী-সুত লম্বোদর। দোয়াররা গাইছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো।”[৮]

এই বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা দর্শকমনে বিতৃষ্ণা তৈরি করত বলে মথুরানাথ সাহা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি গত শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁদের দলে জুড়িদের অবলোপ অত্যন্ত জরুরি মনে করেছিলেন। যদিও মতিলাল রায়ের উত্তরাধিকারীরা প্রচলিত ধারাতেই জুড়ি গান পরিবেশন করে গেছেন পরবর্তী প্রায় দশ-পনেরো বছর ধরে। মতিলালের মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় বুঝেছিলেন যুগের হাওয়ার সঙ্গে পা ফেলে চলতে না পারলে অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা প্রবল। তাই ক্ষুব্ধ হলেও তাঁকে যাত্রার রীতি অনেকটা বাধ্য হয়েই বদলাতে হয়েছিল। অথচ তাঁর অগ্রজ ধর্মদাস রায়-এর মতো তিনিও চেষ্টা করে গেছেন মতিলালের আদর্শ যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে। মতিলাল ও ধর্মদাসের মতো ভূপেন্দ্রনারায়ণ, আসরে বসে গান লিখতে পারতেন। সঙ্গীতপ্রধান ষোলোটি পালার অনেক গানেই তাঁর কবিত্বশক্তির প্রকাশ আছে। তাঁর গানে মতিরায়ের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হলেও একেবারে অদৃশ্য নয়।

মতিলাল রায়ের সমসাময়িককালে ব্রজমোহন রায় তাঁর নিজের নামে দল করে খুব দ্রুত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। সুকণ্ঠের অধিকারী ব্রজমোহন প্রথমে পাঁচালি দল করে জনপ্রিয়তা পেলেও, দলাদলির প্রতিযোগিতায় অশ্লীল ইতরতার বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্ত হয়ে পাঁচালীর দল তুলে দেন এবং যাত্রার দল গঠন করেন। তাঁর রচিত পালায় গানের আধিক্য সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

“তাঁর পালার প্রতিটি চরিত্র আসরে নেমে প্রথমে বেশ একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা করে, তারপর তারই অনুরূপ একখানি গান ধরে। প্রত্যেক চরিত্রকেই গান গাইতে হয়েছে। গানের কবল থেকে কারও রক্ষা নেই, -না শ্রোতার, না অভিনেতার। ব্রজমোহন যাত্রাপালায় উনিশ শতকের প্রথানুযায়ী প্রত্যেক চরিত্রকে দিয়ে নাচিয়ে নেওয়ার রীতি বদলে দিয়ে, পরিবর্তে প্রত্যেকের কণ্ঠে গান ব্যবহার করেছেন। স্বল্পায়ু ব্রজমোহন, মাত্র চার বছরের মধ্যেই যাত্রামোদী সমাজে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মতিলাল রায়ের মতো দীর্ঘকাল ধরে যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে ব্রজমোহন পরবর্তী যুগে যাত্রায় অনেক নূতনত্ব সৃষ্টি করতে পারতেন।”[৯]

যাত্রা প্রয়োজনায় পেশাদার মঞ্চের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন মতিলাল এবং ব্রজমোহন প্রায় একই সঙ্গে। পুরোপুরি থিয়েট্রিক্যাল মেজাজ আনার জন্য পরবর্তীকালে মথুরানাথ তাঁর দলে ব্যালে নাচ বা সখীদলের প্রচলন করেন। তদানীন্তন থিয়েটারের প্রখ্যাত সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচী, ভূতনাথ দাস প্রমুখ প্রশিক্ষক যাত্রায় যুক্ত হওয়ার জন্য প্রচলিত সঙ্গীতচর্চায় অনেক নতুনত্ব দেখা

দিয়েছিল। যদিও সমসাময়িক যাত্রানুরাগীদের কাছে যাত্রাভিনয়ের সর্বাত্মক বদল খুব আদরণীয় মনে হয়নি। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এই বদলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছিলেন—

"পূর্বকালের যাত্রা অধ্যক্ষ ও নাটক রচয়িতাগণ আধুনিক নাট্যকারগণের মতো বিদ্বান না হইলেও তাঁহারা ভক্ত ছিলেন; এবং তাঁহাদের নাটক ও তন্মধ্যস্থ গীতাদি সেই ভক্তিজাত প্রাণের আবেগে রচিত হইত বলিয়া অতি সহজেই দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিত। ...তখন দৃশ্যপটের জাঁকজমক বা পোষাক পরিচ্ছদের চাকচিক্য ছিল না বটে কিন্তু তাহাদের সেই সরল ভাষায় রচিত সরলপ্রাণের সরল কথাগুলিই সেই সোজা কথায় রচিত অনুপ্রাশবহুল গীতগুলি শুনিয়া দর্শকগণ আত্মহারা হইতেন; এবং সে অভিনয়ের ও সে সঙ্গীতের তান বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাদের প্রাণে বাজিতে থাকিত। আর সে রূপ অধিকারীও নাই এবং সে প্রকারের যাত্রাও নাই। এখনকার যাত্রা কতকটা সেকালের এবং কতকটা এ কালের থিয়েটারীভাবে গঠিত একপ্রকার খিঁচুড়িবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[১০]

অল্প কয়েকমাসের ব্যবধানে যতীন্দ্রমোহন সিংহ পূর্বোক্ত অভিযোগকে তীব্রতর করে লিখেছিলেন—

"যাত্রা গানের বর্তমান যে যুগ চলিতেছে ইহাকে 'নাটকীয় যুগ' বলা যাইতে পারে। এ যুগে যাত্রা হইতেছে নাটকের ব্যর্থ অনুকরণ। এখন যাত্রায় আর গান নাই, এখন যাত্রা হইতেছে 'অভিনয়' বা 'অপেরা', স্টেজবিহীন থিয়েটার।"[১১]

যতীন্দ্রমোহন 'জুড়ি' নামধারী চোগা-চাপকানপরা পিরালী-পাগড়ি-মাথায় মোক্তার লোকদের বিদায়ে খুশি হলেও থিয়েটারের প্রভাবে সাংগীতিক প্রয়োগের বিষয়ে খুশি হতে পারেননি। তিনি লিখেছেন—

"যাত্রার পৌরাণিক যুগে এক একটি ভাল গান শুনিয়া শ্রোতাদিগের অশ্রুপাত হইত, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই গান বঙ্গের পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইত, ও ক্রমে তাহা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে (classics) পরিণত হইত। এখনকার গানে না আছে ভাব, না আছে মর্মস্পর্শী সুর। অনেক গানের সুরই থিয়েটারের অনুকরণে মিশ্রিত রাগিণীতে (জঙ্গলা) বাঁধা। বিশুদ্ধ ভৈরবী, পূরবী, খাম্বাজ, বেহাগ, বিভাস প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সুর এখন যাত্রার আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। যে সুর গাম্ভীর্যে এ্যম্বোধিনির্ঘোষ, মাধুর্যে পিককূজন, উচ্চতায় পাপিয়ার স্বরলহরী, কোমলতায় চাতকের ফটিকজল, লালিত্যে সলিলের কুলুকুলু ধ্বনি এখনকার যাত্রাগানে তাহা আর শুনা যায় না। যে সুর শ্রোতার হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া জন্মজন্মান্তরে সুখদুঃখের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, যাহা মর্মে মর্মে জড়িত হইয়া ভাবী সুখের সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখে, এখনকার যাত্রায় সে সুর নাই।"[১২]

যতীন্দ্রমোহনের পর্যালোচনায় তদানীন্তন অধিকাংশ সুরেই যে গাম্ভীর্যের পরিবর্তে হালকা সুরের প্রবর্তনা দেখা দিয়েছিল, তাতে প্রাচীনপন্থী শ্রোতারা খুশি হতে পারেননি। তাঁর মতে—

"যেমন দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে আমরা গাম্ভীর্য হারাইতেছি, সঙ্গীতেও তাই। জীবন আমাদের কেবল 'ফুর্তিতে' ভরা, তরল উল্লাসে মাতোয়ারা, আমাদের আমোদ প্রমোদও সেইরূপ।"[১৩]

উপযুক্ত সংখ্যক গায়কের অভাব এবং সময় সংক্ষেপের কারণে জুড়িগান ক্রমশ যাত্রার আসর থেকে যখন বিলুপ্তির পথে হারিয়ে যাচ্ছে- প্রায় সেই সময় 'বিবেক'-এর প্রবর্তনা যাত্রাপালায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে 'সাঁতরা কোম্পানি' যাত্রাদলে অহিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর লেখা 'সুরথ উদ্ধার' (১৯০৩) পালায় দিবদাস চরিত্রকে বিবেক রূপে প্রথম তৈরি করেছিলেন। চরিত্রলিপিতে দিবদাসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'ভক্ত উন্মাদ' হিসেবে। গানের ভাষায় নিজেকে সে 'দিবে পাগলা' বলেছে। পরবর্তী প্রায় ষাট-সত্তর বছর ধরে যাত্রাপালায় বিবেকের গান প্রভৃত জনপ্রিয়তা বজায় রেখে বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে বলা যায়।

বাংলা যাত্রাপালার গঠন বৈশিষ্ট্যে বিবেকের গানের উপযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

"বিবেকের গান একাধারে নাট্যকাহিনীর দার্শনিক ও নৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যা এবং রসসঞ্চারের শক্তিমান মাধ্যম। বিবেক সনাতন নীতির শরীরী প্রতিনিধি, নিয়তির স্পষ্ট সঙ্কেত ও উচ্চারিত নির্দেশ- অন্তরাত্মার বিবেকাশ্রয়ী আত্মপ্রকাশ। বিবেকই বাঙলা যাত্রা নাটকের পতাকাচিহ্ন।"[১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাত্রার প্রথাগত বৈশিষ্ট্যে বিবেকেরই মতো (বর্তমানে লুপ্ত) 'নিয়তি' নামে একটি নারী চরিত্রের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। গৈরিক অথবা শুভ্র বসন পরিহিত মাথায় পাগড়ি বিবেক চরিত্রের পাশাপাশি, কালো ঘোমটার আবরণে ঢাকা এক রহস্যময়ী নারী চরিত্র যাত্রায় মূলত করুণ রসের সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হত। যাত্রা সঙ্গীত প্রয়োগে জুড়ি গানের প্রচলন অবলুপ্ত হলেও, 'উক্তিগীতি'র আবশ্যিকতা বহুকাল বজায় ছিল। একক গায়ক চরিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত এই বিশেষ ধরনের গানের জনপ্রিয়তাও পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রখ্যাত অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"প্রাচীন যাত্রায় গানের একটি বিশেষ স্থান ছিল। একটি পালায় ৩০-৪০ খানা গান থাকত। গানের মধ্যে আবার উক্তিগীতির প্রাধান্য ছিল। মতি রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, সাঁতরা কোম্পানি, বৈকুণ্ঠ, পানেদের দলের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। ওসব দলে উক্তিগীতির খুব আকর্ষণ ছিল। বিশ শতকের যাত্রায়ও উক্তিগীতি ছিল। উক্তিগীতির সঙ্গে বড় বড় অভিনেতাকে ভাব অভিনয় করতে হত। গানের সুর গলায় তুলতে না পারলে, গায়কের সুরের গতি ঠিক মত ধরা যায় না। এর ফলে ভাব অভিনয়ে অসুবিধা হয়। তাই আমাদের সময়ের যাত্রার বড় অভিনেতাদের গান জানতে হত।"[১৫]

যাত্রা বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

"যাত্রার জুড়ি-গীতি বন্ধ হইবার পরেও উক্তিগীতি রহিল। কিন্তু ইহার পরিবেশন রীতি পরিবর্তিত হয়। একক গায়ক-চরিত্র এই গীতি পরিবেশন করিতে থাকে।"[১৬]

বিশিষ্ট সুরকার মহেন্দ্র দত্ত বিশ শতকের প্রথম দু-দশকের যাত্রায় সঙ্গীত ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন, প্রায় ১৪ ঘণ্টা অভিনয় হত সে-সব পালায়। প্রতিটি পালায় প্রায় ৪০ জন স্ত্রী-পুরুষ থাকত, নাটকের গান ছিল ৩৫ থেকে ৪০টি, জুড়ি গান ছিল, এরপর বিবেক, ঋষিবালকগণের গান ছিল। ১৩২৭ নাগাদ যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি জানিয়েছিলেন—

"জুড়ির গান ইত্যাদি কিছুটা উঠাইয়া দিয়া রহিল বিবেক, একজন ছেলে, ফিমেল গাইয়ে, ঋষিবালকগণ, দৈত্যবালকগণ, ঝাড়ুদারগণের গান। সম্মিলিতভাবে মোট গানের সংখ্যা হইল ৩২/৩৩ খানা। ...তখন ক্ল্যাসিক্যাল সুর প্রচলিত ছিল। আমিও এইসবগুলির মাঝখান থেকে ইহাদের আমলেই ১০/১২ খানা নাটকের সুর দিয়াছি এবং তখন হইতে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকে ৩২ হইতে ৩৬ খানা গানের সুর দিয়া আসিয়াছি।"[১৭]

জুড়ির গান বিলুপ্ত হলেও, নতুন রীতির পালায় বিবেক, ফিমেল গাইয়ে ছাড়াও নানাধরনের গণের গান, ডুয়েট, সখীব্যাচ অপরিহার্য থেকে গেল। তবে ধীরে ধীরে প্রকৃত গাইবার লোকের অভাবে এবং সময় সংক্ষেপের কারণে পালানাট্যে এইসব গানের প্রয়োগ বিলুপ্ত হয়ে গেল। মোটামুটি ১৯৩৮ পর্যন্ত প্রতিটি মুদ্রিত পালা অনুসরণ করলে বোঝা যায় এই গীতিবাহুল্য অব্যাহত ছিল।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পেশাদার যাত্রায় পালাকার হিসেবে যুক্ত হন ব্রজেন্দ্রকুমার দে। তিনি তাঁর যাত্রা-সংস্রবে আসার সময়কার কথা জানিয়েছেন—

"যাত্রা পালায় বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ; গানের সংখ্যা খুব বেশী, অথচ গাওয়ার মতো গলা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে; সখীর গান আরম্ভ হলেই শ্রোতারা বিরক্ত হয়; কোরাস গান, ডুয়েট গানও কেউ আর নিতে চাইছে না।"[১৮]

তাঁর বাল্যকালে শোনা গানের প্রসঙ্গে পরিণত বয়সে অন্য একটি রচনায় তিনি বলেছেন—

"দল নদীতে নৌকা ভাসিয়ে চলে যেত পেছনে ফেলে যেত তাদের পাগলকরা গান। রাত দুপুরে কোন চাষী বা পথিক পথ দিয়ে হয়ত গাইতে গাইতে যেত আপন বুঝে চল এই বেলা। আজ সে গানও নেই সেই গায়কও নেই।"[১৯]

ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রা সংস্কারে মনোযোগী হয়ে পালাতে গানের সংখ্যা কমিয়ে ১২-১৩ টি করেন। অভিনয় সময়সীমা পাঁচ ঘণ্টা থেকে নামিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা করা হয়। ২৫-২৬ টি দৃশ্য কমে ১৬-১৭ তে সীমাবদ্ধ করেন। দ্বৈত নৃত্য, দঙ্গলের গান কিংবা গণের গান ক্রমশ বিলুপ্ত হতে শুরু করে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে যাত্রায় সঙ্গীত প্রয়োগে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস। মতিলাল রায় যেমন তাঁর পালায় বক্তৃতায় মাতিয়ে রাখতেন ভক্ত দর্শকদের, তেমন মুকুন্দ দাস তাঁর উদ্দীপনামূলক গানে জাতীয়তাবোধের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। চারণকবির পালায়, তাঁর রচিত ও সুরারোপিত সঙ্গীত জনজাগরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, নিজস্ব গায়নভঙ্গি ও গীত রচনার মাধ্যমে। স্বাদেশিকতার প্রচারকে স্পষ্টভাবে কাজে লাগিয়ে নতুন রীতি যাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন মুকুন্দদাস। তাঁর যাত্রাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের দীর্ঘপ্রচলিত পীড়ন-ব্যবস্থার প্রতিবাদ কণ্ঠে ধারণ করে সামাজিক পালা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, 'সাদা পোশাকের যাত্রা' হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। তিনি তাঁর পালায় সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি, গোবিন্দচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখের রচিত গান যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতিও গেয়েছেন। নজরুল ইসলামের অনুমতি নিয়ে পল্লীসেবা পালায় তাঁর গান যুক্ত করেছিলেন। এছাড়াও উল্লেখ্য, অনেক অজ্ঞাত ও অখ্যাত গীতিকারের গানও তিনি তাঁর পালায় নিয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রা সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর গুরু স্বল্পায়ু ভোলানাথের ভূমিকার কথা বারবার স্মরণ করেছেন নিজেকে উত্তরাসাধক হিসেবে অভিহিত করে। ব্রজেন্দ্রকুমার লিখেছেন—

"যাত্রা-নাটকের ভাষা যে পণ্ডিতি না হলেও চলে, গীতাভিনয়ের গীত যে সুখপাঠ্য হতে পারে, সংলাপের স্রোতে যে শ্রোতাদের ভাসিয়ে নেওয়া সম্ভব, যাত্রার ক্ষেত্রে ভোলানাথবাবুই তা প্রথম দেখালেন। ...এই মানুষের ভেতর যে এত রস ছিল, কারও তা বোঝবার উপায় ছিল না। তাঁর অপূর্ব গান দেবকণ্ঠ বাগচীর সুরে গণেশ অপেরা পার্টির কোহিনূর পালায় একানে ছেলের মুখে যখন গাওয়া হত, শ্রোতাদের তখন বাহ্যগান থাকত না।"[২০]

ভোলানাথ আদি রসাত্মক ডুয়েট বা দ্বৈত সঙ্গীত-যা পালার সঙ্গে সম্পর্করহিত ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানি, নাপিত-নাপিতানি, ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদারনি, মেথর-মেথরানি প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হত- তা বর্জন করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার, ভোলানাথকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যেমন গীত রচনায় অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তেমন তাঁর পালায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) প্রমুখের গান ব্যবহার করেছিলেন মুকুন্দদাসের প্রবর্তনার উত্তরাধিকার বহন করে।

বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনবত্ব আনার নতুন নতুন চেষ্টায় একদিকে যেমন গানের সংখ্যা কমানো হয়েছিল, তেমন গানের কথাতেও একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। জুড়ি, সখীব্যাচ, ডুয়েট, প্রস্তাবনাগীত প্রভৃতি একে একে বিলুপ্ত, অথচ পালার দর্শক যাঁরা তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী এই সঙ্গীত বৈচিত্র্যকে সংযুক্ত রাখতে হয়েছে দীর্ঘকাল। এমনকি মূল কাহিনির সঙ্গে খাপছাড়া হলেও সব ধরনের গান রাখতেই হত। তবে এসবের মধ্যে 'বিবেক'-এর স্থায়িত্ব নানা ধরনের রূপান্তর সত্ত্বেও যাত্রা আঙ্গিকের সঙ্গে একাত্ম থেকেছে দীর্ঘকাল। গত শতকে পঞ্চাশের দশকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন—

"আগে একখানা নাটকে ৫০ খানার মত গান থাকত- মায় জুড়ির গান। এখন ১০/১২ খানায় এসে ঠেকেছে এবং জুড়ি নেই। প্রত্যেক দলে এক একটি করে বিবেক শ্রেণীর গাইয়ে থাকা চাই, যাত্রার বৈশিষ্ট্য- এটা এখনও বজায় রেখেছে। এই বিবেক স্বর্গীয় অহিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর সুরথ উদ্ধার নাটকে প্রথম আমদানি করেন। তার আগে ছিল মতি রায়ের 'নারদ'। এই নারদ গাইত, দীর্ঘ বক্তৃতা করত এবং জুড়ীর গান আরম্ভ হলে দাড়ি খুলে তামাক খেত। বিবেকের গতি ছিল আগে অবাধ, এখন সে মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছে, গানও তার হয়েছে সীমাবদ্ধ।"[২১]

যাত্রাগানের আসর থেকে গায়কের গোষ্ঠী নির্মূল হতে আর দেরী নেই -এই আশঙ্কায় বিচলিত ব্রজেন্দ্রকুমার সত্তরের দশকের শুরুতে, কারণ হিসেবে বলেছিলেন—

"এক একটি পালায় গানের সংখ্যা এখন পাঁচ খানায় দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে সুরকারের দোষেই হোক, কি গায়কের দোষেই হোক তিনখানাই জমে না।"[২২]

—এরকম মন্তব্য করেছিলেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সূত্রেই। কেননা বছর দুই আগে, তাঁর রচিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন' পালা পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়ে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পাঁচটি গানের মধ্যে তিনটি গানই পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিয়েছিলেন- দর্শকরা পালায় গান শুনতে চান না এই অজুহাতে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, উৎপল দত্ত এর বছর খানেক আগে যখন পেশাদার যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হন, 'রাইফেল' (১৯৬৮) পালা নিয়ে তখন এরকম সমস্যায় তাঁকেও পড়তে হয়েছিল। পালায় বিবেক চরিত্র ফিরিয়ে এনে তিনি প্রায় ছ'খানা গান দিয়েছিলেন তার কণ্ঠে। কিন্তু প্রথম দুটি গানের পর, তৃতীয় গান আরম্ভ হলেই দর্শকদের মধ্য থেকে চিৎকার উঠত- আমাদের নাটক দেখানো হোক। এই প্রত্যাখ্যানের কথা মাথায় রেখেই মুদ্রিত গ্রন্থে-সূত্রধরের কণ্ঠে মাত্র চার পঙক্তির একটি সঙ্গীতাংশ দিয়ে পালার সূচনা, কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতা থাকলেও অন্য কোনো গানই রাখা হয়নি। উল্লেখ্য, উৎপল দত্ত তাঁর পালায় সঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, কেননা পুরোনো যাত্রায় জুড়ি ও বিবেক কেন ব্যবহার করা হত সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। পরবর্তীকালে একটি বিখ্যাত পালা 'সন্ন্যাসীর তরবারী' (১৯৭২)-তে ফকির মুশার কণ্ঠে গানের পর গান দিয়েছেন -সেসব গানের কথা ও সুর বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

যাত্রাপালায় সঙ্গীত সংযোজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পালাকাররাই নিজেদের লেখা গান ব্যবহার করতেন। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রমুখ পালাকারদের উত্তরসাধক হিসেবে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ বাগ প্রমুখের মধ্যে সেই ধারারই অনুবর্তন লক্ষিত হয়েছে। গত শতকের সত্তরের দশকে যাত্রায় যে সর্বাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল- তাতে সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অভিনবত্ব প্রদর্শিত হয়। বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার জুটি প্রথা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে তাদের গলায় গান ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে একটা আবশ্যিক শর্ত হিসেবে দেখা দেয়। মূলত এই সময় থেকেই বাইরের খ্যাতনামা সুরকারদের হাত ধরে স্বনামধন্য গীত রচয়িতাদেরও সংযোজন ঘটতে থাকে। কথা ও সুরের অভ্যস্ত সমন্বয়ের সাফল্য সহজ হবে এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করে। যথারীতি গানের

প্রয়োগ পদ্ধতিতেও যুগোপযোগী বহু বদল সংঘটিত হয়। বর্তমানে অবশ্য সেই প্রবণতাই প্রাধান্য পাচ্ছে, পুরোনো বা চলতি হিন্দি-বাংলার হিট গান নায়ক-নায়িকার গলায় গাইয়ে দিয়ে দর্শক মনোরঞ্জনের একটা আলাদা ছক তৈরি করাই এখনকার স্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিবেক থেকে গায়ক-নায়ক আর এখন টিম-ওয়ার্কের যুগে প্রায় অনেককেই গান গাইতে হয়। মোটামুটি সব শিল্পীর যাঁরা গান গাইতে ইচ্ছুক ভয়েস ট্রেনিং নেওয়া উচিত। তা না হলে হয়ত এমন একদিন আসবে যাত্রার নিজস্ব গান বলে কিছু থাকবে না। সর্বত্রই সিনেমার গান চলবে সেটা যাত্রার পক্ষে ক্ষতিকারক এবং যাত্রার দর্শকরাও সেটা চায় না। তারা মৌলিক গান চায়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি যাত্রার প্রসঙ্গ উঠলেই সবসময় শ্রদ্ধান্বিত মন্তব্য করতেন। বিশেষ করে যাত্রার সাংগীতিক ঐতিহ্য স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন—

"গানই ছিল যাত্রার প্রাণ। গানের সুর বৈচিত্র্য ও ভাবের আবেদনের উপর পালার ভালো মন্দের বিচার হতো।"[২৩]

যাত্রার থিয়েট্রিক্যাল রূপান্তরকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। গত শতকের সত্তরের দশকে আত্মরক্ষার প্রশ্নে যাত্রা যখন সংকটাপন্ন, তখন মন্মথ রায়ের মতো প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব ১৯৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি.এল. রায় রিডারশিপ বক্তৃতামালায় তাঁর 'লোকনাট্য যাত্রাগান' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই যাত্রাগান আত্মরক্ষা করতে পারে, যদি যাত্রা আজ অপেরাধর্মী হয়। পাশ্চাত্য দেশে অপেরা এখনও সগৌরবে বেঁচে আছে। আমাদের দেশে অপেরার প্রচলন তেমন না থাকলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপেরাধর্মী চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের অসামান্য জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। অপেরায় গানের ও নাচের মধ্য দিয়ে নাটক পরিবেশিত হয়। তাতে গদ্য সংলাপের স্থান নেই! ক্ষতি নেই, বাঙালী সঙ্গীতপ্রিয় জাতি এবং তার নাটকপ্রীতিও অসাধারণ। অপেরা একাধারে বাঙালীর সঙ্গীত এবং নাটকের তৃষ্ণা দূর করতে পারে। আর এই অপেরাই হচ্ছে আমাদের সত্যিকার যাত্রাগান। অপেরায় রূপান্তরিত হলে যাত্রাগান বেঁচে যাবে।"[২৪]

অবশ্য এই মন্তব্যের বছর তিনেক পরে, আধুনিক যাত্রায় গীতাভিনয় কিংবা অপেরা প্রথার পুনঃপ্রবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল সত্যম্বর অপেরার 'একদিন রাত্রে' (১৯৭৫) পালায়, পালাকার-নির্দেশক শৈলেশ গুহনিয়োগীর উদ্যোগে। যদিও তাঁর রচিত পালায় গীত রচনা ও সুরসৃষ্টির জন্য তিনি সর্বদাই অন্যের উপর নির্ভর করতেন। শৈলেশ প্রবর্তিত এই আধুনিক উপস্থাপনা খুবই জনসমাদর লাভ করেছিল। তা সত্ত্বেও পেশাদার যাত্রাজগতে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিশ শতকের শেষার্ধে সম্ভাবনাময় সেই উদ্যোগ খুব বেশিদূর বিস্তার পায়নি, এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ঘটনা। এখনকার দর্শক-শ্রোতা যাত্রাপালায় গান শুনতে অনিচ্ছুক-বরং আধুনিক সময়ের জলসার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে পৃথক এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। সে চেষ্টার বাহুল্যে অল্পবয়সিরা খুশি থাকলেও, যাত্রার প্রতি প্রকৃত অনুরক্ত দর্শক-শ্রোতাদের বৃহদাংশ অসন্তোষ প্রকাশ করছেন তীব্রভাবে।

মতিলাল রায় তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কালে লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করে নতুন নতুন যাত্রা সম্প্রদায় গড়ে উঠছে। আর বহুতর পরিশ্রমে তাঁর হাতে তৈরি অভিনেতাদের অনেকেই প্রলুব্ধ হয়ে যোগ দিচ্ছেন সেই সব দলে। তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন- বহু পরিশ্রমে যে সকল নাট্যগীতি প্রস্তুত করেছিলেন, তা এখন সেইসব অভিনেতার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ে প্রচারিত হচ্ছে। তাতে পালাকার হিসেবে তিনি একদিক থেকে গৌরবান্বিত ও আহ্লাদিত বোধ করেও তাঁর রচিত গীতাভিনয়গুলি অনেকের হস্তে যৎপরোনাস্তি দুর্দশাপন্ন হতে দেখে খুব আশঙ্কিত হয়েছিলেন। সেই জন্যই তিনি তাঁর পালাগুলি রেজিস্ট্রি করতে প্রবৃত্ত হন। তার প্রধান কারণ তাঁর পালার বিকৃত অনুকরণ তিনি সহ্য করতে পারেননি। একথা অস্বীকার করার

উপায় নেই, মতিলাল কর্তৃক গৃহীত এই উদ্যোগের জন্যই মুদ্রণের মধ্য দিয়েই যাত্রাপালা গানের বহুতর রচনা সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

বাংলা পালা রচনার প্রাচীন পদ্ধতিকে সংস্কার করে গানের সঙ্গে সদ্য প্রবর্তিত পেশাদার মঞ্চের সংলাপ নির্ভর অভিনয় অংশের প্রাধান্য অনুসরণ করে গীতাভিনয়ের রচনায় মতিলাল যাত্রাপালা প্রযোজনায় শুধু অভিনবত্ব নয় যুগান্তর প্রদর্শন করেছিলেন। ভাষাতাত্বিক সুকুমার সেন মতিলালের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"তিনি গানের সঙ্গে কথকতা জুড়ে দিয়ে এবং ভাড়ামি বর্জন করে গীতাভিনয়ের সুরে উঁচু গ্রামে বেঁধে দিলেন। তার দুদিকে ফল ফলল। তাঁর গানের বিশিষ্ট সুর কথায় গাঁথা পড়ে জনগণের মনোহরণ করলে আর তাঁর পাত্রপাত্রীর মুখে 'বক্তৃতা' অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সরল প্রাণ বয়স্ক নরনারীর মনে তৃপ্তি দিলে। এই যে একটা বড় 'সাংস্কৃতিক' ও 'সাহিত্যিক' কাজ, যার সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশরই কোনো ধারণা নেই, এই একটি লোকের দ্বারাই সংসাধিত হয়েছিল। যাত্রার দল করে মতিলাল রায় যতটা আভিজাত্য ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন এমন কোন নটনাট্যকার তো দূরের কথা কোনো কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিত কখনো পায়নি এদেশে।"[২৫]

মতিলাল রায় সমকালের শ্রেষ্ঠতম নাট্যপ্রতিভা গিরিশচন্দ্র ঘোষ-কেও সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। মতিলাল রায়ের উত্তরসাধক হিসেবে পরবর্তীকালে বহু পালাকার বাংলা যাত্রাপালার গান রচনায় তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

Conclusion:

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে পুরো বিশ শতক জুড়ে বাংলা যাত্রার গানে কত ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে, গীত রচনায় কাব্যগুণের কত বিচিত্র সমাহার ঘটেছে, তার ধারাবাহিকতার পূর্বাপর পরিচয় তুলে ধরা বেশ কঠিন কাজ। শুধু অধ্যাত্ম দিক থেকে বা ভক্তিরস সঞ্চারের দিক থেকে নয়, মানবিক মূল্যবোধ, শোক দুঃখ ও আনন্দানুভূতির পাশাপাশি সার্বিক আত্মিক উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রেও এইসব যাত্রাগান পালার সাময়িক উপভোগের বাইরে মানবজীবনে সুফলপ্রসূ ভাবনাকে বিস্তার দিতে পেরেছে। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য-সম্প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, স্বদেশবোধ-ইতিহাসের বীরোদাত্ত পটভূমিতে দেশ নায়কদের জয়গান, লক্ষ লক্ষ যাত্রাপ্রেমীদের মনে বহুতর উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে বিভিন্ন সময়ে। সবচেয়ে উল্লেখ্য, গত শতকে গণসঙ্গীতের ভাবাদর্শকে সামনে রেখেও পালাকাররা গণনাট্য আন্দোলনের গতিবেগ উপলব্ধি করে যেসব সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাতে যাত্রাপালার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আবার উল্টোদিকে অভিনীত পালা মাত্রেই পুস্তক আকারে মুদ্রিত হয় না। ফলে, অধিকাংশ গানের আয়ু অভিনয় শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে যায়। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুদ্রিত পালা আজকের দিনে খুব সহজলভ্য নয়। তাছাড়া, আসরে অভিনীত পালাকেই যে মুদ্রণের সময় অবিকল রাখা হয়, তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালার সঙ্গীত সংখ্যা কমানো হয়, যাতে শৌখিন দলের কাছে সেটি পরিবেশন করার চেষ্টায় সঙ্গীতের ব্যবহার কোনো প্রতিবন্ধকতা না তৈরি করে। যে কারণে বহু বিখ্যাত পালার অনেক সাড়া জাগানো গান শেষ পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। গত শতকের শেষ দু-দশকে যাত্রাপালায় গান রচনার বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে তার স্বকীয় মহিমা হারিয়ে সঙ্গীত প্রয়োগের দিকটিকে গৌণ করে দিয়েছে। নতুন শতাব্দীতে প্রায় সূচনা কাল থেকেই হিন্দি-বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ব্যবহার এতটা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে যে, মৌলিক যাত্রাগানের চর্চা বিলুপ্তির পথে হারিয়ে যেতে বসেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্গদর্শন পত্রিকা, কার্তিক সংখ্যা, ১২৮০।

২. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়, চলন্তিকা, ১৩৭৪, পৃ. ৩৩৪।

৩. চক্রবর্তী, অধরচন্দ্র, রেকর্ড-কাকলী, তারা লাইব্রেরি, ১৩৩২, পৃ. ২১২-২১৪।

৪. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্গদর্শন পত্রিকা, ১২৮৯, ফাল্গুন সংখ্যা।

৫. পূর্বোক্ত, যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়, পৃ. ২০০-২০১।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০-২০১।

৭. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, ‘এই কি লভিনু লাভ’, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ আশ্বিন, ১৩৭৪, পৃ. ৭।

৮. চৌধুরী, অহীন্দ্র, নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৮৮৪, পৃ. ১৬০-১৬১।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮৭-৫৮৮।

১০. নাট্যমন্দির পত্রিকা, ১৩১৮, অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

১১. সিংহ, যতীন্দ্রমোহন, যাত্রাগান, প্রবাসী পত্রিকা, ১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. পূর্বোক্ত।

১৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, ২০০২, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৪৫৩।

১৫. মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ, যাত্রার সেকাল ও একাল, শায়ক, ১৯৬৯, পৃ. ২৪।

১৬. ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ৬২।

১৭. দত্ত, মহেন্দ্র, যাত্রাগান: আমার বক্তব্য, শায়ক, ১৯৬৯, পৃ. ৪১-৪৩।

১৮. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, দাও ফিরে সে অরণ্য, চতুরঙ্গ পত্রিকা, ১৯৭২।

১৯. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, ছেলেবেলায় দেখা যাত্রার স্মৃতি, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন স্মারকপত্র, দ্বিতীয় বার্ষিক, ১৯৭৫, পৃ. ৫।

২০. পূর্বোক্ত, দাও ফিরে সে অরণ্য,।

২১. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, যাত্রার কথা, রূপমঞ্চ পত্রিকা, ১৯৫৪।

২২. দে, ব্রজেন্দ্রকুমার, সেকাল ও একাল, নাট্যলোক পত্রিকা, ১৯৭১।

২৩. দত্ত সুনীল, শীল, দীপ্তিকুমার, নাট্যশালা প্রসঙ্গে, শিশিরকুমারের নাট্যচর্চা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮০, পৃ. ৫।

২৪. লোকনাট্য যাত্রাগান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃ. ৫১।

২৫. সেন, সুকুমার, যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়, চলন্তিকা, ১৩৭৪, পৃ. ৭।

Citation: **Sau Bhaumik. M.,** (2025) "বাংলার যাত্রাপালায় যাত্রাগানের বিবর্তন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-06, June-2025.